প্রতিভাবানের প্রতিক্রিয়া

শেখর বসু

খুব বড় মাপের লেখক বা শিল্পীরা নিশ্চয়ই খুব স্পর্শকাতর হন। কোনও কিছুকেই তাঁরা হয়তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাই যদি হয়, তাদের কাজের নিন্দেমন্দ বা প্রশংসাকে তাঁরা ঠিক কী ভাবে নিয়ে থাকেন? নিশ্চয়ই আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মতো করে নয়। বাইরের জগতে তাঁদের প্রতিক্রিয়া একটু অন্য ধরনের। প্রতিভার জ্যোতির্বলয়ে ধাক্কা খেয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে প্রকাশ অতিমাত্রায় সংহত ও সংযত। কিন্তু কৌতূহল জাগে-ভেতরের ছবিটা ঠিক কী রকম?

আমরা এমন একটা প্রশ্নের অনেকখানি উত্তর পেয়েছিলাম দিলীপকুমার রায়ের 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে।

দিলীপকুমার একবার শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : শরৎদা, কেউ যদি আপনার লেখার নিন্দে করে আপনি কি বিচলিত হন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র একটু পাশ কাটিয়ে তরুণ দিলীপকে বলেছিলেন : তুমি যখন সাহিত্যিক হবে, এই প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে আপনা - আপনিই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু দিলীপকুমার প্রশ্নের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে একই প্রশ্ন আবার করেছিলেন। এড়াতে না পেরে শেষে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: কেউ চাবকালে ফোস্কা পড়বে না— এ কখনও হয়?

দিলীপকুমারের স্বনামধন্য বাবা দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হলে রাতে ঘুমোতে পারতেন না অনেক সময়। বসে বা পায়চারি করে রাত ভোর করে দিতেন। বাবার কথা ছেলেই লিখেছেন স্মৃতিচারণে।

দিলীপকুমার কৃতবিদ্য হওয়ার পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও তিনি একবার এই প্রশ্নটি করেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় তখন এক ধুরন্ধর সমালোচকের একটি সমালোচনা বার হয়েছিল। সমালোচক লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ যে কবি হতে পারলেন না— তার একটাই কারণ: ছন্দের কান নেই রবীন্দ্রনাথের।

দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথকে একটু উশ্‌কে দেওয়ার জন্যে এই সব কথা তুলেছিলেন। উত্তরে কবি হাসতে হাসতে বলেছিলেন: শুধু এই সব নয়, এমন আরও অনেক কথা আমাকে শুনতে হয়েছে যে। এসব কথার সময়ে সময়ে আমার রাগ খুব চড়ে যেত। তবে একটাই বাঁচোয়া—রাগ হলেই আমার মন তটস্থ হয়ে বলে ওঠে: করছ কী! সামলাও। নিজেকে নিয়ে নিরীক্ষা শুরু করি। শুনতে পাই দুই কানের পাশ দিয়ে গরম রক্ত মাথায় উঠছে। যেই টের পাওয়া অমনি সাবধান হওয়া।

বিগলিত হয়ে দিলীপকুমার বলেছিলেন: আপনার তুলনা শুধু আপনি। শুনে হেসে উঠে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: ওই দেখ, তুমি আমাকে খুশি করে দিলে। হ্যাঁ হে হ্যাঁ, আমি শুধু রাগতেই জানি না, খুশি হতেও জানি— মানে চট করে খুশি হই।

দিলীপকুমার বলেছিলেন: আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না— আপনি খুব রাগতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'একবার বলে দেখ তো— আপনি অকবি।'

'স্মৃতিচারণ' অনেকদিন আগে পড়েছি, কিন্তু বিখ্যাত মানুষদের কথোপকথনের এই অংশটুকু আমার মাথায় থেকে গিয়েছিল, আজও আছে। এর সঙ্গে আবার মিশে গেছে একান্ত ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতাও।

আমার কর্মজীবনের একটি পর্যায়ে কিছুকাল 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় কাজ করেছিলাম। সত্যজিৎ রায় তখন 'দেশ' ও 'আনন্দমেলা'র পুজো সংখ্যায় দুটি উপন্যাস লিখতেন। দেশে ফেলুদাকে নিয়ে এবং অনন্দমেলায় শঙ্কুকাহিনি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে পুজোসংখ্যার সব উপন্যাসের মধ্যে এই দুটি ছিল সবার ওপরে।

সব বয়সের পাঠকরা মুখিয়ে থাকতেন এই দুটি কাহিনি পড়ার জন্যে। বুদ্ধি, রসজ্ঞান, শিল্পসুষমা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার সে এক 'আশ্চর্য মিশেল। আরও একটি জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করত তা হল সত্যজিতের আশ্চর্য পরিমিতিবোধ। যেখানে যতটুকু রাখার দরকার, ততটুকুই রাখতেন। একটিমাত্র বাক্যে যা বলা যায়, তার জন্যে কখনোই একাধিক বাক্যের সাহায্য নিতেন না।

শুনেছি, পুজোসংখ্যার উপন্যাস লেখা শেষ হলে সত্যজিৎ তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুকে তা শোনাতেন বা পড়াতেন। তারপর পত্রিকা-অফিসে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রেসে কম্পোজ করতে পাঠানোর আগে শঙ্কুকাহিনি কয়েকবার পড়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। আনন্দমেলার সব লেখাই ছাপাখানায় যাওয়ার আগে সম্পাদকীয় বিভাগ ভালো করে পড়ে নিত। প্রয়োজনে কিছু সম্পাদনা হত। নির্ভুল পত্রিকা বার করার চেষ্টা থাকত সব সময়।

পত্রিকায় বিশেষ বানানবিধি মানা হত, ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু সত্যজিৎ রায়। যে বানান তিনি লিখতেন, সেই বানানই রাখা হত। সম্ভবত সেটা ১৯৮৪ সাল, সত্যজিতের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যথারীতি গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেটি আমি পড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম। লেখকের হস্তাক্ষরের কিছু প্রতিলিপি বিভিন্ন জায়গায় ছাপার সুবাদে অনেকেই দেখেছেন। তবে মূল পাণ্ডুলিপি হাতে নেওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা।

ধপধপে সাদা কাগজে কালো কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপি। হাতের লেখার ধাঁচ উনিশ শতকী পন্ডিতদের মতো। কোণা-ওঠা ধারালো হরফ, হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, য-ফলায় জোরালো দীর্ঘ টান। উপন্যাসের সঙ্গে নিজের আঁকা ছবি পাঠাতেন সত্যজিৎ। অসাধারণ ওই সব ছবি ওঁর লেখাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলত। লিখিত শব্দের মধ্যেও বিস্তর ছবি থাকত। সে সব ছবি তাঁর

লেখা পড়ার সময় পাঠকদের মনের পর্দায় ভেসে উঠত। পাণ্ডুলিপি পড়ার সময় সেই অভিজ্ঞতা আমারও হত। কী লেখা সেবার পড়েছিলাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবে ওঁর, শঙ্কুকাহিনিগুলি ওলটালে অবশ্যই মনে পড়ে যাবে।

সেই উপন্যাসে জার্মানির একটা আশ্চর্য জ্বলজ্বলে পটভূমিকা আছে। জনপদ, রাস্তার নাম, বিভিন্ন জার্মান চরিত্রের নামধাম। উপন্যাসের মূল কাহিনি তো বটেই, কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জার্মানির ওই অপরূপ পটভূমি আমার দারুণ কাহিনি তো বটেই, কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জার্মানির ওই অপরূপ পটভূমি আমার দারুণ লেগেছিল সেদিন।

উপন্যাসটি প্রেসে পাঠাবার দু-একদিনের মধ্যেই কী-একটা প্রয়োজনে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে যেতে হয়েছিল আমাকে। বিশপ লেফরয় রোডে বাড়ি। সাহেবি আমলের বাড়ি। বিশাল বিশাল ঘর, খুব বড় - বড় জানলা-দরজা, ঘরের সিলিং বেশ উঁচু।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ঘরে ঢুকলাম, কিন্তু তক্ষুণি - তক্ষুণি ওঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। অতিথি ছিলেন ঘরে। বিশাল ঘরের দরজার কাছেই পার্টিশন - দেওয়া একটা জায়গা। ওখানে বসার কিছু চেয়ারও ছিল, হয়তো দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করার জায়গা।

মস্ত ঘরে মস্ত জানালার পাশে সত্যজিতের কাছের টেবিল, একটি আরামকেদারা, আর অতিথি - অভ্যাগতদের জন্যে বেশ কিছু চেয়ার। বইয়ের কয়েকটা আলমারি বইপত্তরে ঠাসা, চওড়া টেবিলেও কিছু বই।

পার্টিশনের একটা ধারের দিকে বসার জন্যে ওই সব দৃশ্য আমার চোখে পড়ে যাচ্ছিল। টুকরো - টুকরো কিছু কথাবার্তাও ভেসে আসছিল কানে।

ওই সব টুকরো কথা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম অতিথি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন আমলা। দিল্লির আসন্ন চলচ্চিত্র-উৎসবে সত্যজিৎকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। মিনিট - দশেক ওখানে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে, সুতরাং টুকরো - টুকরো অনেক কথাই কানে এসেছিল। তবে মাত্র একটি কথা ছাড়া বাকি সবই এখন ভুলে গিয়েছি।

কোনও একজন আধুনিক বিদেশি লেখকের নাম বলার পরেই ওই আমলা বলেছিলেন, 'পারহ্যাপস ইউ হ্যাভ হার্ড হিজ নেম।' সঙ্গে সঙ্গে জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন সত্যজিৎ, 'ইয়েস, আই হ্যাভ রেড হিম।'

মিনিট - দশেক পরে ডাক পড়েছিল আমার। কাছে যেতেই ওঁর একটা স্বগতোক্তি শুনেছিলাম: সবাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসে, কিন্তু যাওয়ার কথা সবার খেয়াল থাকে না।

বুঝলাম ওই আমলা কাজের মানুষের অনেকটা বাড়তি সময় নিয়ে নিয়েছেন। টেবিলের ওপর সত্যজিতের রাইটিং প্যাড, কলম, পেপার ওয়েট চাপা-দেওয়া লেখা-কাগজ কয়েকটি, পেজমার্ক লাগানো গোটা তিনেক মোটা বই। বিশাল মাপের আন্তর্ঝাতিক মানুষটির সময় অত্যন্ত মূল্যবান, সেই সময় কিছুটা অকারণে নষ্ট হওয়া ঠিক নয়। আমার পাঁচ মিনিটের কাজ বোধহয় তিন মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলেছিলাম।

যাওয়ার সময় কী মনে হয়েছিল কে জানে, হঠাৎই দুম করে বলে ফেলেছিলাম-আপনার এবারের শঙ্কুকাহিনি প্রেসে পাঠাবার আগে পড়ে ফেলেছি, দারুণ লেগেছে আমার!

সামান্য ওই কথাটি শুনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন ছ ফিট চার ইঞ্চি লম্বা রাশভারী মানুষটি। ঝলমলে মুখে বলে উঠলেন—তুমি এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছ!

আমার সামান্য ওই কথাটার এই প্রতিক্রিয়া ভাবতেই পারিনি আমি। বলেছিলাম— উপন্যাসে জার্মানির ওই পটভূমি আর জার্মান চরিত্রদের নামটামগুলো খুব মানানসই হয়েছে।

পরের দৃশ্যটি পাকা রংয়ে আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। আজও দেখার চেষ্টা করলেই দেখতে পাই। কি বলব, আমার ওই কথাটা শুনে অভ্রংলিহ ব্যক্তিত্বটি নিমেষের মধ্যে মাটির কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। খোলামেলা ভঙ্গিতে হেসে নিয়ে ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'সাহেবদের এই নামটাম দেওয়ার ব্যাপারে কেউ আমাকে হারাতে পারবে না।'

বিশাল আকৃতির ওই আন্তর্জাতিক মানুষটি তারপর কিছুক্ষণ খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে গল্প করেছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। একটু অদ্ভুত ধরনের খাবার এসেছিল। একই প্লেটে নারকেলের নাড়ু আর চানাচুর। পরে চা।

কাজের মানুষের কাজের সময় বেশ কিছুক্ষণ সেদিন নষ্ট করার পরে অক্ষয় এক স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। অসাধারণ প্রতিভাবানরা নিন্দা - প্রশংসায় বিচলিত হন কি না- আমার মনের মধ্যে পুরনো এই প্রশ্নটি ছিলই। 'স্মৃতিচারণ' ইত্যাদি বইতে প্রশ্নের কিছু উত্তর পেয়েছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ওই একবারই হয়েছে।

ওই উপন্যাসটি সেবার ছাপার আগে ঘরোয়া দু-চারজন পাঠকের বাইরে আমিই ছিলাম প্রথম বাইরের পাঠক। বাইরের প্রথম পাঠক হয়তো লেখকের একটু বেশি মনোযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু সেটাই বোধহয় সব নয়। অর্বাচীন পাঠকের ভালো লাগাতেও প্রথিতযশা লেখকরা খুশি হন, হয়তো কখনও - কখনও উচ্ছ্বসিতও হয়ে ওঠেন; যেমন হয়েছিলেন সেদিন সত্যজিৎ।